মীরার দুপুর : এক স্বতন্ত্র নারীর গল্প

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩-য়। উপন্যাসটির ভেতরের গল্পের সময় ১৯৫০। অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ - ষাট বছর আগেকার এই উপন্যাস। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার এই উপন্যাস। আজ এই একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষে উপন্যাসটি আমরা কিভাবে পড়বো? এই প্রায় ছ'দশকে যে মধ্যবিত্ত জীবন এ উপন্যাসের গল্প তা সময়ের স্রোতে অনেক পাল্টেছে, ১৯৫০-এর যদি কেউ আকস্মিক এ সময়ে চলে আসেন তাহলে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের এই শ্রেণির লক্ষ্য-উপলক্ষ্য, জীবনচর্যা, মূল্যবোধ, মূল্যবোধহীনতা, পরিবার সবকিছু দেখে তার অচেনাই মনে হবে। 'মীরার দুপুর'-এ দেড়-দু'টাকার ভালো পর্দার কাপড় পাওয়া যায়, আস্ত পোনা-কাটাপোনা তিনটাকা - সাড়েতিনটাকা সের, কইমাছ চারটাকা, একটাকা সিকিতে দুটো ডিম ও দুটো সিগারেট পাওয়া যায়। আবার কলেজের অধাপকদের দারিদ্র্য চোখে পড়ার মতো, অসুখ হলে স্ত্রীকে ঋণ করতে বেরোতে হয়, পঞ্চাশ টাকা ঋণ পেলেই অনেক কিছু কেনা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবের চিত্র এভাবেই উপন্যাসের শরীরে ছড়িয়ে রেখেছেন। উপন্যাসটি উপন্যাসের মতই নিজ সামর্থের ছবি বহন করে। এ এখনকার পাঠকের কাছে অচেনা দৈনন্দিন জগৎ, যারা খণ্ডিত বাংলায় জন্মেছে তাদের কাছে তো বটেই গত চল্লিশ বছরে মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব দ্রুততালে পাল্টেছে। কিন্তু গভীর বাস্তবে কি? আমাদের এই অব-ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত অস্তিত্বে পরিবর্তনের সচলতাও শেষ পর্যন্ত এক অপরিবর্তনের বন্ধতায় আটকে যায়। মীরার দুপুর-এর গল্প, ঐ সময়ের ফ্রেমে এমনভাবে বলা হয়েছে, এমন সব প্রশ্নকে উপন্যাসে সামনে আনা হয়েছে যে, খুচরো সাময়িকতা পেরিয়ে এ গল্প আজকের গল্প হয়ে ওঠে।

গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু মীরা ও তার জীবনের দ্বি-প্রহর। গল্পটা শুরু হচ্ছে মীরার স্বামীর চোখ দিয়ে মীরাকে দেখায়। ''চশমা চোখে মীরাকে কত ছোট্টটি দেখায়। মনে হয় স্কুলে পড়ছে'' আর চশমা না থাকলে মনে হয় ''অনেক অভিজ্ঞতায় তনু মন জরানো পূর্ণবয়স্কা চতুরা এক নারী।'' এই ভাবনায় হীরেণ যেমন থাকে তেমনি মীরাও। মীরার মনের যে বহুমাত্রিকতা, চেতন-অবচেতনের জটিল ঝালর তা হীরেণের সৃষ্টিতে পাই। চশমা পরা মীরা, না-পরা মীরা। চশমা পরা মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হীরেণের মনে হয়েছে, এই মুখে সেই অসহায়তা, সেই কোমলতার মধুমর্মর জেগে আছে। পুরুষের কাছে নারীর সলজ্জ প্রার্থনা। সেবার স্নেহের অভিভাবকত্বের। আয়নায় নিজের হাসপাতাল প্রত্যাগত রুগীর প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে বুদ্ধিমতী মীরাকেই হীরেণ দেখে।

গল্পটি হীরেণ থেকে শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে হীরেণের আত্মহত্যায়। এর মাঝখানে মীরার পরিক্রমা, তার ভেতর - বাইরের নানামাত্রা আঁকা। গল্পটা আমরা বলতে চাইনা, আমরা দেখাতে চাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সযত্ন নির্মাণ। প্রতিটি চরিত্রের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা তিনি দেন, যেমন ধরা যাক কাজের মেয়ে মালতী : ''লম্বা গড়ন। কালো রং। কালোপাড় ফর্সা একখানা কাপড় পরনে টান করে বাঁধা খোঁপায় মালতী শুকনো মোরগ ফুল কি খয়েরি ট্যাসল হাতিয়েছে।'' কিংবা আর্টিস্ট'' : লাল ট্রাউজার, ভায়োলেট পপ্লিনের হাওয়াই শার্ট গায়ে, হাওয়ায় উড়ে ক্রমশ কোঁকড়ানো লম্বা চুল, তেলহীন।'' অমরেশ, পিঙ্গলচোখ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কাঁধ। হীরেণের চোখে মীরা: উন্মুক্ত কৃপাণের মতো প্রখর ভ্রূযুগল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ কালো চক্ষু ও বুদ্ধি মার্জিত পরিচ্ছন্ন একটি চিবুক।'' কয়েকটি মানুষের ডায়ালগের ছকে উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে, ওই সংলাপের মধ্যদিয়ে উপন্যাসিকের বীক্ষা নানামাত্রায় সামনে আসে। 'মীরার দুপুর' আসলে গল্পর মধ্য দিয়ে এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছে যা সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। একটি নারী তার অসুস্থ আপাতত উপার্জনহীন, রবীন্দ্রনাথ-রঁলা-বার্ণার্ডশ-টলস্টয় পড়া বুদ্ধিজীবী স্বামীকে সুস্থ করতে ও রাখতে চাইছে নানাভাবে, ঋণ করে, একজনের কাছে না পেলে অন্যজনের কাছে গিয়ে। চাইছে একটি চাকরি যাতে এই মর্যাদাহীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে পারে। আর অসুস্থ স্বামী সচেতন যে মীরা তাকে বাঁচাতে চাইছে, তাকে সুস্থ করতে চাইছে। কিন্তু ঐ বুদ্ধিজীবীও সংশয়ে দীর্ণ হয়, মীরার বাইরে যাওয়ায়, টাকা নিয়ে আসায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। মীরার অর্থাৎ তার স্ত্রীর আচরণকে বুঝেও সংশয় তিমিরে আচ্ছন্ন। হয়তো তার অক্ষমতা তাকে আর জটিল মনে অন্ধকারে নিয়ে যেতে থাকে। মীরার কর্মদক্ষতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে থাকে। আর বোন বুলা থেকে শুরু করে বাইরের মানুষও মীরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হীরেণের মনে হয় বিয়ের পর থেকে মীরার কাজের আবরণে— নিজেকেই ঢেকে রাখতেই পছন্দ করেছে। আর আজ মীরা ''পরনের ঝকঝকে বেগ্নি মাদ্রাজি শাড়ি ছেড়ে ফেললেও ও ছাড়লো চকচকে কালো শার্টিনের ব্লাউজ। শুধু সায়া রক্তের মত লাল। সায়া আর জংলি ছিটের আধময়লা ব্রেসিয়ারে মীরাকে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জনেও যদিও শরীটাকে কেমন অদ্ভুত হিংস্র, অশ্লীল মনে হয় হীরেণের।'' আর মীরাই এখন অনেকের কাছে এঞ্জেল। মীরার-হীরেণের 'সম্পর্ক এভাবেই এগোতে থাকে এক অনিবার্য ভয়ঙ্করতার দিকে। এটাই গল্পে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই অনিবার্যতাকে উপন্যাসে নিয়ে আসেন হীরেণ-বুলা-আর্টিস্ট-বিপদবরণ, মীরা-অমরেশ-পুষ্প -ভোমরা-আর্টিস্ট-সংলাপের মধ্য দিয়ে, শেষ ঘটনার দিকে উপন্যাসটি যায়। নির্মাণের ছক একটা থাকে কিন্তু আকস্মিকতাও জীবনের মতই খাঁজে খাঁজে পাঠক অনুভব করে। আর্টিস্ট -ভোমরা বা রাতের যানে আর্টিস্টকে মীরার পকেটমার হিসাবে আবিষ্কার, শেষ ঘটনার অনুঘটক হিসাবে বিপদবরণের ভূমিকা —এ সবই আকস্মিক, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর এই

গল্পে দুটিকেই মেলান, তর্ক-বিতর্কর মত করেই সাজিয়ে দেন, চরিত্রগুলিকে। কলেজ জীবনে অমরেশের আকর্ষণ ছিঁড়ে মীরা বুদ্ধিজীবী চরিত্রের হীরেণকে বেছে নিয়েছিল। সেই নির্বাচন তার এখনকার জীবনের বাস্তবে যে ধাক্কা মারে তাতে সাধারণ প্রচলিত উপন্যাসের গল্পের উপাদান আছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই উপাদানকে অন্যমাত্রা দিলেন। মীরার ক্রমবিবর্তন ঐ মাত্রায় এমন রূপ নিল যে শেষের ঘটনায় তার ঠান্ডা স্থির আচরণ— একটা বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠা করে।

বস্তুত মীরা, ১৯৫৩-য় প্রকাশিত উপন্যাসের চরিত্র, মীরা মাঝখানের পাঁচদশক পেরিয়েও আমাদের কাছে, আমাদের মধ্যবিত্ত আবহে নতুন ও অচেনা। চেনা একজন নারীকে এই যে defamitrazize করে তোলা, সামাজিক গভীর প্রশ্নের উৎস করা এটাই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব। হীরেণ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেন : ‘‘হীরেণের অমিত বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী”, তার মীরার সম্পর্কর ফাঁকগুলো হীরেণের অসুখ-অস্ত্রোপচারের পর স্পষ্ট হয়। যেমন ‘‘দেবদারু পাতার সহজ লাবন্য রৌদ্রে পুড়ে কালো হতে চললো।” মীরা রক্তের মতো লাল সায়া খুলে যখন আটপৌরে ঢাকাই বুটিদারে ও শরীর সজিয়ে ফেলে তখন হীরেণ দেখে শান্তশিষ্ট মীরা। ‘‘ঘরোয়া মীরা; হিংস্র মীরা; সবুজ বেগ্‌নি মেরুণে ঢাকা উজ্জ্বল এঞ্জেল মীরা।” এই দুই মীরাকে হীরেণই দেখতে পায়— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মীরাকে এভাবেই উপান্যাসে বহুমাত্রিক বাস্তবে দাঁড় করান। মীরা চাকরি করায় হীরেণ ক্ষুব্ধ, তপেশ লাহিড়ী কেমন লোক, যে মীরাকে চাকরি দেবে। অথচ চাকরির অপরিহার্যতা মানতে হয়, গৃহবন্দী হীরেণকে বাঁচাবার জন্যই তো মীরা বাইরে যাচ্ছে, চাকরি খুঁজছে। মীরার মনে হয় হীরেণ তাকে ঈর্ষা করছে। মীরা কার কাছ থেকে টাকা নেয়? পুরুষের ঈর্ষা, সন্দেহ হীরেণের বইপড়া অস্তিত্বেও প্রখর থাকে। তার বুদ্ধি ও স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়। এ উপন্যাসে একটা বড়ো কোড চিহ্ন। তুমি আবার বেরচ্ছো?’ মীরা তখন ‘‘আটপৌরে ঢাকাই ছেড়ে গোলাপী সায়া পরতে ব্যস্ত। কাঁচুলি ঢাকলো সোনালী ছাইরঙা ব্লাইজে। সূক্ষ্ম লালপড়া বসানো হাতা।”

মীরা দাদার কাছ থেকে আর ধার পাবে না বুঝে শেষ পর্যন্ত যায় সেই অমরেশের কাছে। অমরেশ মীরাকে দেখে আহ্বান জানায়, এসো এসো, মরুর দেশে নীহারকণা। প্রচন্ড স্বাস্থ্যবান, অ্যাথলিট সেই অমরেশ, এখন যেন একটু শুকনো। ‘‘অমরেশের পরনে ডোরাকাটা স্যালুয়া, গায়ে একটা রাগ জড়ানো।” একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে। ঘর বিশৃঙ্খল। মীরার স্বর কাঁপছে। অমরেশ, যাকে প্রত্যাখ্যান করেই মীরা হীরেণকে বিয়ে করে — আশ্চর্য সুন্দর হয়েছো বিয়ের পর। মীরা তার আসার কারণ জানায় — অমরেশ জানে না এত কথা, সে তো মীরার ঠিকানা জানত না। অমরেশের কথায় মীরা হাসে : ‘‘পাহাড়ী ঝরণার ঝিরঝিরানির মতো।” একটি উপমায় বদলে যায় মীরা। মীরাকে টাকা দেয় — মীরার ঠিকানা না জানলেও অমরেশের ঠিকানা তো মীরা জানতো। মীরা মুখ নুইয়ে রাখে। বাইরে বেরোয় না মীরা? হারেম ছেড়ে বুঝি চক্রবর্তী বাইরে আসতে দেয় না? ‘‘দিচ্ছিলোনা, তবে ঈশ্বর তার এই সাধ পূরণ করে নি।’ মীরা একটা চাকরি চায়। অমরেশ আশ্বাস দেয়।

অতীত ফেরে কলেজের সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে, কলেজের সবচেয়ে পন্ডিত গুণী চক্রবর্তীর চিত্ত জয় করেছে। অমরেশ আসেনি বিয়ের সন্ধ্যায়। অমরেশের টাকায় মীরা অনেক কিছু কিনলো। নিজের জন্যও। বিয়ের পর থেকেই তো মীরা কর্জ করে সংসার চালাচ্ছে। টাকাটা কোথা থেকে এল? মীরা হীরেণকে সত্যটা বলবে না। ‘‘অমরেশ যেমন তার জীবনে সংগোপনে রয়েছে, তেমনি এই টাকাটাও গোপন থাক?” মীরা লক্ষ্য করেছে বিয়ের পর, আরও বেশি অসুখের পর হীরেণ ঈর্ষান্বিতা। ‘‘শুধু কি ঈর্ষায় লোকের চোখের তারা আচমকা এত ধারালো হয়ে উঠে না, একদিকে সূক্ষ্ম প্রশ্ন অন্যদিকে সমবেদনার উচ্ছ্বাস —বস্তুত হীরেণ যে সময় - সময় কী করে, কি রকম হ’য়ে ওঠে তার গলার সুর, চাউনি, মুখের হাবভাব তা সে নিজে বুঝতে পারছে না। মীরা বোঝে। স্ত্রীকে সন্দেহ করার জন্য মুহূর্তে পুরুষ এই হয়। এই হ’লো হীরেণ শেষ পর্যন্ত।” দেখা হয় পুষ্পার সঙ্গে বেথুনের সহপাঠী। মস্ত বড়লোকের মেয়ে। হীরেণকে আগেই সে একবার বলেছে, পুষ্প তাকে ধার দিয়েছে। সেই পুষ্প বিশালকায় বুইক গাড়িতে। সঙ্গে সুদর্শন তরুণ অনুপ ‘‘ভোমরা চিকন পাখার মতো নতুন গোঁফের রেখা, পরিচ্ছন্ন আবেশচঞ্চল চোখ” পুষ্প বলে মীরাই বা কি খারাপ আছে, অধ্যাপকের সঙ্গে প্রেম করেছে, তাকে বিয়ে করেছে, গিন্নিবান্নি হয়ে এখন বাজার করছে। পুষ্পরও প্রশ্ন মিস্টার চক্রবর্তী বেশি বাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না বুঝি! করতো না কিন্তু বাইরে যাচ্ছে। অকৃতজ্ঞ। পুষ্পও বলে, ভয়ংকর স্বার্থপর জীব ওরা। মীরা বন্ধুর কাছে অকপট— বাড়িতে না থাকলেই দুর্ভাবনায় মরে। এত তাড়াতাড়ি যদি বিয়েটা না করতুম।” মীরার বিয়ে সম্পর্কেই বিতৃষ্ণা এভাবে শুরু হয়।

বিপদবরণ আসে হীরেণের কাছে — মেটে রং-এ জামার ওপর নীল টাই। মীরা বাড়ি নেই। হীরেণের গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখে বিপদ মুগ্ধ। বিপদ উকিল, প্র্যাকটিস অষ্টরম্ভা। হীরেণ বিপদ স্কুল কলেজের সহপাঠী। বিপদ সংকোচে মীরার চাকরির প্রসঙ্গ তোলে : ‘‘একলার আয়ে কারুর দশদিনের বেশি চলছে না। মিডল ক্লাসটা একেবারে মরে যাবে।” ম্যাট্রিক পাশ বউকে সে ঢুকিয়ে দিতে চায় কোথাও-কিন্তু তিনবছরে দুটি এসে গেছে, আরও একটি আসছে। তাদের বন্ধু যতিশঙ্কর পাইলট-অধ্যাপক-উকিলের চেয়ে অনেক বেশি উঠে গেছে। কিন্তু তার সুন্দরী বউ পালিয়েছে - বিপদ হেসে জানায়। হীরেণ বলে, শক্তহাতে ধরলে, এমন হতো না। কিছু না, বেরোবার যে সে বেরোবেই। বিপদ ঠিক গুলি করে মেরে ফেলতো। হীরেণের মিসেস কখন ফিরবে। বিপদ জানায় হীরেণ অনেক ভালো আছে। তার বউ

খাওয়া-ঘুম আর ইয়ে দেবার জন্য সংসারে এসেছে। আর মিসেস চক্রবর্তী স্মার্ট, বুঝেসুজে চলেন। মীরার সন্তান হলে কি পরিচর্যা করত, বিপদ চলে যাবার পরে হীরেণ ভাবে। না। মীরার পেটে কোনো শিশুই আসবে না। এটা এঞ্জেল মীরা চক্রবর্তীর ঘর। এঘরে ওষুধ, বড়ি, থার্মোমিটারের সঙ্গে দু রকমের ফুল। রুগীর মনকে প্রফুল্ল করতে। মালতী কি করছে। তোমার স্বামী আছে মালতী? আছে দাদাবাবু, সিঁথিতে দেখছো না। তোমার স্বামী কি করে। সিনেমা কোম্পানির দারোয়ান। তোমরা দুজনেই রোজগার করছো? না, স্বামী আমার রোজগারে খায় না। কি রকম? তোমরা লেখাপড়া জানা লোক গো মাজাঘষা মন। মুখ্খুর কীর্তি শুনলে হাসবে । মন হয়েছে বাবুর। গোঁয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তার মরণ হয়েছে। এমন বিয়ের কপালে লাথি মারি। আর আসবে মিনসে এই দোরে, আসুক, কাটারি দিয়ে নাক কান কেটে দেবো। আমার বয়স যায়নি। আমি মরো না। মালতীর কালো আঙুলে শাদা পাথর বসানো আংটি ঝলসে ওঠে। ললিত কলেরায় মৃতপ্রায়, কেউ নেই মালতী ট্যাক্সি ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ফিরে এসে মালতী গোপাল স্যাকরার দোকানে গিয়ে কানপাশা বিক্রি করেচে, ললিত জেরা করে, কোন কিছু জানতে চাইল না, করল চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ। মালতী ঘৃণায় উচ্চারণ করে পুরুষ!' এর আগে বুঝি তুমি বাইরে যেতে না। ও যেতে দেবে বাইড়ে? না খাই, না খাবো তোকে বাইরে পাঠাচ্ছি না: তুই আমার বুকের পায়রা ঘরের পরী। হীরেণ বোঝাতে চয়, বেশি ভালবাসত বউকে ললিত, মালতী মানে না। এই যে দিদিমণিরা বাইরে যাচ্ছে, চাকরি করছে গাঁঘেষে চলছে রাজ্যের পুরুষের সঙ্গে রাস্তার গাড়িতে, দাদাবাবুরা কেউ কি মনখারাপ করে বাড়িতে মুখভার করে বসে আছে? বললাম সব মীরা দিদিমণিকে। বসে, কোন দুঃখে তুই ললিতের কাছে যাবি। লেখাপড়া জানা মেয়ে তো, ভালো বুদ্ধি দিলে। এখন আছে মালতী কেশবের সঙ্গে : হিঁদু বলে দুবার বিয়ে করতে পারে নি। রেশনের ট্রাক চালায়— দুজনে রোজগারে সুখে আছে। মালতীর এই সংলাপ আছে হীরেণ-মীরার সংলাপ। ললিতকে ছেড়ে মালতী ভালই করেছে, হীরেণ বলে, কিন্তু আসলে সেও তো ললিত। জ্যোতিরিন্দ্র বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক হীরেণ আর সিনেমার দারোয়ান ললিতকে এক স্তরেই দেখিয়ে দিলেন।

উপন্যাসের ভোমরার গল্প অন্য ছবি। ''কার্জন পার্ক, শ্রাবণের আকাশ মেঘে-মেঘে কালো নীল হয়ে আছে। হোয়াইটওয়ের ঘড়িতে চারটে বেজে পনেরো। একটু দূরে একঝাঁক সূর্যমুখী মাথা জাগিয়ে চেয়ে আছে মীরাদের দিকে। আর আলতো হাওয়ায় একটু একটু নড়ছে। সূর্যমুখীর জঙ্গলের ও-পাশ দিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে আর একটা ট্রাম চলে গেল।'' এই আবহে ভোমরা ও মীরা। অনেকদিন পরে দেখা। ভোমরার স্বামী আর্টিস্ট মজুমদার। ভোমরা তাকে ছেড়ে চলে এসেছে। পশু ছোট্ট ভোমরাকে নিয়ে, ডলকে নিয়ে মজুমদার টায়ার্ড। সেকি কোন দীর্ঘাঙ্গির দেখা পেয়েছে — মীরা বলে অমানুষ লালসা। ভোমরা নীরব। স্তব্ধতা। দূরে সূর্যমুখীরা বাতাসে কাঁপছে। বেবি কার কাছে। আমার: মীরার স্মৃতিতে ভাসে কলেজের ভোমরা — যে স্ট্যাম্পের অ্যালবাম খুলে বসছে, নয়তো বিলিতি বা বাংলা উপন্যাস। পরীক্ষা না দিয়েই ওর বিয়ে হয়ে গেলো— বিলেত ফেরত এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রেম ও পরিণয় আকস্মিক। খুকীর মত, ডল ভোমরা। ভোমরা এখন কাকাবাবুর আশ্রয়ে, তিনি আধুনিক - আধুনিকাদের মতিগতি বুঝতে পারেন না। চৌরঙ্গির আকাশে বিজ্ঞাপনের রক্ত - ঝড় বইছিলো, ভোমরা একদৃষ্টে চেয়ে। উইলস্ ফোর্ড, ডিল্যুক্স। এক সেকেন্ডে তিনটে গাড়ি ও পাঁচটা সিগারেটের নাম পড়লে মীরা।'' ১৯৫০-৫৩র কলকাতা। বিজ্ঞাপনের। ভোমরাও ভাবে, একটা বাচ্চা নিয়ে ঠেকে গেছে, নইলে একটা চাকরি সে করতে পারতো না। পাঠক ভাবতে পারে, ঐ মালতীর মতন। ভোমরার সঙ্গে দেখা হবার পর মীরা তার কর্তব্যর জ্বলন বোধ করে, হীরেণকে অনুকম্প করতে তাকে। ভোমরার দুঃখ এসেছে একভাবে, মীরার দুঃখ এসেছে আর একবাবে। ইউনিভার্সিটির ঝকমকে রত্ন হাইলি ইনটেলেক্চুয়াল আধুনিক হীরেণ চক্রবর্তী সন্দেহে শীর্ণ— মীরা তাকে অনুকম্পা করে। ভোমরা কাঁদে, কিন্তু মীরা হুল ফোটাবে। হীরেণ কি করবে। কান্নাপায়, ঘৃণা হয়। সে হারেম বিলাসিনী — আজ আর নয়, ইচ্ছে মত রাত করে বাড়ি ফিরবে।

হীরেণের ঘরে অযাচিত আগন্তুক—আর্টিস্ট। এই বেহায়া নির্লজ্জ মানুষটিকে দেখে হীরেণ চমকায়। ''মিসেস এখনো ফেরেননি বুঝি? ''আপনার ঝি-কি চলে গেছে।'' —না গেলে একটা দেশলাই ওকে দিয়ে আনিয়ে রাখতাম। আর্টিস্ট শিস দেয় সুন্দর। পাশের ফ্ল্যাটে একলা থাকে। জেনেশুনেই মীরা এ বাড়িতে এসেছে। : ''মীরার এক একটা রুচির পরিচয় পেয়ে হীরেণ স্তব্ধ, বিমূঢ়। সেই এঞ্জেল মীরা, নীল মেরুনে মোড়া পালিশ ঝকঝকে মীরা।'' মীরা বোঝায় আর্টিস্ট নিয়ে তাদের আপত্তি তোলা অশোভন। মেয়ে সম্পর্কে শিল্পী উৎসাহী। সে হীরেণকে তার স্টুডিওয় আমন্ত্রণ জানায়। যায়, ছবি দেখে, হাত পা চুল ও মুখ বসানো লম্বা একটা থার্মোমিটার। আর্টিস্ট যেমন দেখেছে তেমন এঁকেছে। উদ্ধত লাল রং - আর সিলিণ্ডারের মধ্যে নীল রক্তের শিরার মতো পারদের রেখা একশ দশ ডিগ্রী উঠেছে। ''সাত টেম্পারেচার: স্ক্যাণ্ডাল শোনাবার জন্য স্কাউন্ড্রেল ওইসব ছবি এঁকেছে। তিনবোনের ছবি, সুন্দর মুখ, কিন্তু রাতদিন পোকাঝরত, কোন শান্তি পায়নি এমন সুশ্রী চেহারা, ভেতরটা এমন বীভৎস — হীরেণ বিশ্বাস করতে চায় না। মজুমদার চিরকাল আর্টিস্ট ছিল না, ছিল ইঞ্জিনিয়ার। একেবারে গৃহী। তার স্ত্রী, একজন অ্যাম্বিশাস ওম্যান। একদিন বিলিয়ার্ড খেলা সেরে বাড়ি এসে দেখে দরজায় ডিবচ পান্না সিন্ধিয়ায় গাড়ি। চারফুট আটশ আটের শরীরে এত অ্যাম্বিশান। আর আর বন্ধুর স্ত্রীদের মত ডল বোকা ছিল না। সে নিজের পথ বেছে নিয়েছে। মজুমদারের বিলেত যাবার দরখাস্ত স্যাংশন করায় সিন্ধিয়াকে দিয়ে। বেতন সোয়া চারশ থেকে চোদ্দশ। মজুমদার কিক্ড হার আউট। হীরেণ কি মীরার গল্পই দেখে

মজুমদারের গল্পে?

মীরা কাজে যাবে না বলে হীরেণকে খুশি করে কিন্তু ধারকর্জ করতে বেরোয়। লেখকের ভাষায় : ‘‘চরম বিদ্রোহ বুকে নিয়ে মীরা রাস্তায় নামে।’’ বিয়ে-না-করা পুষ্পার ফুলের মতো জীবন তার সান্নিধ্যে মীরা এবার যাবে, যেখানে আকাশ এখনো অভিমানে নীল হয়ে আছে, যে নিঃসঙ্গ ঘরের ছায়ায় ভালোবাসা মৃতবৎসার মতো পড়ে আছে, সেখানেই সে হাত পাতবে অথবা অমরেশের কাছে। গিয়ে দেখে ভোমরা — সেও টাকা চাইছে এসেছে। অভাব না হলে আসে, ভোমরা ইচ্ছে করছে একটু ড্রিঙ্ক করতে। পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ কোঁকড়ানো চুল, অমরেশ হাসে : ভোমরা ভালবাসার কথা বলে। মীরা তো মদ-টদ খেতে টাকা চাইছে না, চাইছে প্রয়োজনে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দক্ষ চলচ্চিত্রকারের মত এবার চলে যান হীরেণের ঘরে : বিপদবরণ এসেছে। মালতীকে চোখ দিয়ে নাক দিয়ে শোঁকে। সরবে জানায় ইনটেলেক্চ্যুয়াল ছবি আর আধুনিক কবিতা সে বোঝে না। মজুমদারও গলা বাড়ায় দরজায়। খাওয়া-ঘুম- খেলা মেজরিটি তো তাই চায়। বিপদকে বসিয়ে হীরেণ মজুমদারের ঘরে যায়। বিশদ জানে ওসব ইনেটেলেক্চ্যুয়াল ছবি না কচুপোড়া—নিশ্চয়ই ল্যাংটো মেয়ের ছবি এঁকে রেখেছে শালা। এসব ছবি দেখে তাঁর মাথা ধরে। অনেক আকর্ষক ‘‘আধুনিক ঝি মালতী। মালতীকে বকশিস দিতে চায় — না থাক, ওতে মশায়ের দুদিনের বাজার খরচ চলবে। কিসের এত অহঙ্কার মালতীরা। কেউটে সাপ। বিপদ উষ্ম হয়ে ওঠে, মালতীর প্রত্যখ্যানে অপমানিত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চলচ্চিত্রের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বলেন ‘‘এবার ও - ঘরে উঁকি দেওয়া যাক। একাই বোঝাতে চায় আর্টিস্টকে ‘‘একজন খারাপ হয়েচে বলে কি আপনি অ্যাবনর্মাল থাকবেন কেন। চাকরিতে ফিরে যান?’’ বেদনাবোধ থেকে ছবি এঁকেছেন, কিন্তু এখন কপর্দকশূন্য। ছবি বিক্রি হয় না। মজুমদার হীরেণের কাছে টাকা ধার চায়। হীরেণের স্ত্রীই তো টাকা ধার করে হীরেণকে রক্ষা করছে। হীরেণ আবার ঘরে ফিরে আসছে। বিপদ বসে : বিপদ মজুমদারের ওপর খাপ্পা। সব শালাই মডার্ন — গর্দভটাকে বলো মালতীর রুপখানা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলুক। ‘‘ঝি চাকর মালতী মেথর ধাঙড় রিকশাওয়ালাদের আমরা এড়িয়ে চলছি, দূরে সরিয়ে রাখছি, তাই আর্টেরও উন্নতি নেই। নেচার ফুটছে না, আড়ষ্টতা থেকে যাচ্ছে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে।’’ বিপদ সাবধান করে হীরেণকে ব্যাটাকে এক পয়সা যেন ধার না দেয়।

উপন্যাসটির নবম অধ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায় অমরেশের সঙ্গে মীরার মিথস্ক্রিয়া। এই উপন্যাসে একদিক থেকে মেয়েদের মধ্যে মালতী পজিটিভ চরিত্র আর পুরুষদের মধ্যে অনেকটা অমরেশ। ভোমরার স্বপ্ন সংহারের, মীরার সেবার। কী ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে? সুইসাইড শব্দটি এই আলাপে আসে যেন আচমকা। অমরেশ বলে, বিয়ে জিনিসটার ওপর অশ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছে। বিয়ে ও প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ভোমরার কথা ঘুরে ফিরে আসে, যদিও অমরেশ এর মধ্যেই জানায় বিয়ের পর মীরা ঢের সুন্দর হয়েছে। অমরেশ মীরাকে টাকার দরকার হলে চুপ করে থাকতে বারণ করে। ভোমরা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেল কেন? মীরা উত্তর দেয় — বিয়ে খারাপ না। জীবনটা নষ্ট হলো তো। অমরেশ বলে, আমি ভাবতেই পারি না কেন সাধ করে মানুষ ভালোবাসার পাখির পায়ে শিকল পরায়, সোনার শিকল রাতারাতি শিকল হয়ে যাচ্ছে তোমাদের।’’ অমরেশ-মীরা বাইরে যায়।

নাটকের পর্দা উঠছে যেন : ‘‘গঙ্গার ধারে। নির্জন জায়গা। অপরাহ্ন। চলচ্চিত্রের ছবি : একটি জাপানি জাহাজ ভেসে গেল সামনে দিয়ে। কমলা-রং ও অজস্র চিকরি - কাটা ছায়ায় ভরা এমন অদ্ভুত সুন্দর বিকেল অনেকদিন দেখেনি তারা। ঘাসফুলটির মতো ছোট্ট শাদা একটি প্রজাপতি মীরার মাথায় উড়লো কতক্ষণ, নেচে নেচে ঘুরলো।’’ কি করবে মীরা অমরেশ বলে দিক। ভোমরার দুঃখ চোখে দেখা যায়। অমরেশ অবাক চোখে প্রজাপতির নৃত্য দেখে ভারি সুন্দর জায়গা। অমরেশ ভাবতেই পারে না বিয়ের বছরটি না পুরতে ভাঙনের গান শুরু যে কি ক'রে হয়। মীরা ভোমরার অবস্থা পর্যন্ত যেতে চায় না। তার স্বামী ঘরে বসে সব পাচ্ছে। অথচ মীরা যখন ঘরে ফেরে দেখে তার মুখ অন্ধকার, চোখে প্রশ্নর প্রখর বিদ্যুৎ। অমরেশ বোঝায়। আবার বলে ভোমরার থেকে মীরার অবস্থা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মীরা : বিয়ে ক'রে আমার কী সর্বনাশ হ'লো। কেন আমি বিয়ে করতে গেলাম, অমরেশ। মীরা পরামর্শ চায়। অমরেশ যন্ডাগুন্ডা মার্কা ছেলে। রেস খেলে, মদ খায়, নো ম্যারেজ ক্রীড মেনে নিয়ে মেয়েদের পিছু ছোটে। কিন্তু হীরেণের মতে মার্জিত রুচি সম্পন্ন মানুষ। মীরা প্রশস্ত কাঁধে অমরেশ একটু পেছনে হেলানো। ‘‘সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ছে ওর পিঙ্গল চোখে। বাঘের চোখের মতো লাগছিলো অমরেশের সবুজ হরিদ্রাভ ঈষৎ রক্তিম চোখ। কিন্তু সেই চোখে হিংসার জ্বালা ছিলো না।’’ মীরার মনে পড়লো একটু আগে এক হোটেলে অমরেশ বীয়ার খাচ্ছিল : ‘‘সোনালী হরিদ্রাভ পানীয়ের মাথায় রক্তের ছিটার মতো লক্ষ - লক্ষ ফেনার রং ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এই সংলাপে ‘‘সুইসাইড শব্দটি আবার আসে। মীরা আলাদা হতে চায়। অমরেশ তার জীবনদর্শন ব্যক্ত করে ভালোবাসা। ভাল মীরা, কিন্তু বিয়ে জিনিসটাই বাজে। তবে অমরেশ মীরাকে অপেক্ষা করতে বলে, হীরেণের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত। এককালে অমরেশ মীরাকে ভালোবেসেছিল, ভোমরাও তাকে আকর্ষণ করেছিল। সে মীরাকে টাকা দেয় : এই মীরা বলুক হীরেণের ধার-কর্য বন্ধু করছে: স্বামীর স্বাস্থ্যর জন্য স্ত্রী একটু মিথ্যাচারিতার ছাড়পত্র ‘আধুনিক’ সমাজ দেয়। মীরা মীরা গঙ্গার উপরে তাকিয়ে দেখে কালো চিমনির পিছনে কাস্তের মতো রূপালী চাঁদ। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। বন্ধু হীরেণের ঘর থেকে অমরেশ তাকে এখানে এনেছে। অমরেশ পরামর্শ দেয়, চাকরি করা খারাপ না, অনেক মেয়েই করছে, তবে হীরেণ যখন চায় না, তার মনে যখন

এতে সন্দেহ তখন এখন থাক। অমরেশ উপমায় কথা বলে। সিংহ অসুস্থ সুস্থ হয়ে সোনার হরিণকে কি করে রাখে তার শেষ পরীক্ষাটা হয়ে যাক। অমরেশের গরম নিশ্বাস মীরার কানে গালে চুলে অধরে ওষ্ঠে। যেন ছোট্ট একটা ঝড় বয়ে গেল মীরার সমস্তর সত্তার ওপর দিয়ে —। অমরেশ চেকে টাকা দেয়। কত? এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোনাকি পোকাগুলো নেচে নেচে ঘুরছিলো। রেডরোডের আলোর ফুলকির সঙ্গে আড়াআড়ি করে ওরা মাঠের অন্ধকার বিদূরণের চেষ্টা করছিলো কি: মীরার শেষ সিদ্ধান্ত, বিয়ে না করলে মানুষের মন কত ভালো থাকে, তাই ভাবচি। অর্থাৎ অমরেশের মন অমরেশ মীরার গালে চুম্বন করে। দূরে চৌরঙ্গির লাল, বেগুনি, সবুজ আলোর ঢেউগুলি থরথর করে কাঁপছিলো। এ যেন মীরাই। তবে বিয়ে করলে অমরেশ কেমন হতো? বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, যেন অসহায়, নিশ্চয়ই অমরেশ স্বামী হলে তার সন্তান প্রীতির ঠেলায় অ্যাদ্দিনে মীরার স্বাস্থ্য থাকত না। বস্তুতঃ অমরেশ যে মীরাকে মুক্তি দেয় তা ঐ আবেগঘন ভালোবাসার, বিবাহ এই ভালোবাসাকে নানাভাবে মারে? জীবনের প্রখর দুপুরে মীরার এই চূড়ান্ত ভাবনায় দাঁড়ায়।

উপন্যাসটির উন্মোচনের শীর্ষবিন্দু এই অধ্যায়, এরপর ক্রিয়ার ক্রমশ নীচের দিকে আসা। ফিরতে দেরি হচ্ছে, হীরেণ কি বলতে পারে, হীরেণ কি করছে তার এই ভাবনাই আঁকা হয়। বাস্তব সংলাপ নয়। হীরেণ নির্লজ্জ হলে মীরাও জিহ্বা চোখা করবে। হীরেণ 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিসমেন্ট পড়বে। পড়বে, উঠবে—বলবে, মুখ খুলবে। অমরেশ সম্পর্কে হীরেণ কটূক্তি করবে। রাত এগারোটাতে মীরা ধর্মতলা স্ট্রীটে। এই ভবিষ্যতে, নিকট ভবিষ্যতে বাড়ি ফিরলে কি হবে, এটা ভাবার অর্থ বর্তমানের সম্পর্ক মনের দিক থেকে প্রায় ছিন্ন। আর আত্মমগ্ন মীরা এক আকস্মিকের সম্মুখীন—বাসে একজন পকেটমার সন্দেহে ধরা পড়ে। সে আর কেউ নয়, আর্টিস্ট মজুমদার। সি.আই.ডি. মীরার স্বামীর নাম, বাড়ির নম্বর জানলো— কারণ সে বলেছে এক 'আমি চিনি। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। অতি সৎজন ও আর্টিস্ট', দুজনে বাস থেকে নামে, একটু জ্যোৎস্না, একটু বিজলী আলো, ফুরফুরে হাওয়া ও কৃষ্ণচূড়ার ঝিলমিলে ছায়াভরা নির্জন পেভমেন্টের পটভূমিকায় দুজনে দাঁড়িয়ে। আবার মীরা ভাবে, হীরেণ কি বলবে, সে কি বলবে। মীরা ও মজুমদার চায়ের দোকানে ঢোকে। মজুমদার জানায় তার এক মডেল ছিল। যখন আঁকলো তখন দেখা গেল প্রত্যেকটি রেখা তাকে বিট্রে করেছে। আর্টিস্ট মীরা কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা বলে। বাসে বিপন্ন অবস্থায় সে মীরার রূপ দেখে ছিল, রূপের মন্দিরে জ্বলছে ত্যাগ তিতিক্ষা আর সংযম। ইউ আর বিউটি অব বিউটিজ। একটা সুন্দর শিহরণ মীরার কাঁধ বেয়ে। কিন্তু মীরার বলতে ইচ্ছে করছে, মিথ্যে, এসবের মূল্য কেউ দেয়নি, মডেল হিসাবে কতদূর কাজে লাগবো? কিন্তু বলতে পারে না। এর মধ্যে বিপদবরণ আসে রেশনের পাওয়া উদ্ধৃত্ত চিনি দোকানে বিক্রয় করতে। আর্টিস্ট মৃগাঙ্গ মজুমদারকে আক্রমণ করে কথার ছুরিতে। মীরা সম্পর্কেও দোকনের মালিক বন্ধু নিরাপদর কাছে কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। এখানেও বিপদবরণ আর্ট সম্পর্কে তার মতামত সরবে প্রকাশ করে। মালতীর প্রসঙ্গ তোলে।

আজ মীরা ঘরে ফিরে দেখে অন্যদিনের মতো হীরেণ বসে অপেক্ষা করছে না। অন্যদিন ''এই ইনটেলেকচুয়্যাল মনের ভাব গোপন করে, মীরাও বাইরের জীবনে যা ঘটে অক্লেশে তা গোপন রাখে। আজ দেখে ঘুমের ওষুধ খেয়ে হীরেণ ঘুমোচ্ছে। হীরেণ জেগে থাকলে নগ্ন দেহে আয়নায় দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব হতো, ঘুমন্ত হীরেণের জায়গায় টেবিলে ঘুমের ওষুধের শিশিটা সেই কাজ করছে। অমরেশের চেকটা নেবে, না ফিরিয়ে দেবে? ফিরিয়ে দিলে অমরেশ শক্‌ড হবে, মীরা তা চায় না। পেয়ে নয়, ত্যাগ করে অমরেশের সুখ। মীরা স্বামী নিয়ে সুখে থাকুক অমরেশ এটা দেখেই তৃপ্ত। কোনো পুরুষ এভাবে কি তৃপ্ত থাকতে পারে? অমরেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না মীরা। টাকা ফেরত দিলে অমরেশ ভাববে, মীরার পাতিব্রত্যই প্রকট। হীরেণ তোমার পাতিব্রত্যের কোন দামই দেয় না।

এর পরের পরিচ্ছেদে, ভারি মনেরম সকাল। হীরেণ -মীরার সম্পর্কের মায়া। এই সকালেই মালতীর কাছে টাকা চায় তারা — কর্জ। এক ধার করা অস্তিত্ব তাদের — বাড়ির কাজের লোকের দেওয়া টাকায় হীরেণই বাজার করতে চায়। ঘরে বসেই পাঁচটাকা ধার পাওয়া গেল। হীরেণ কতদিন পরে বাজারে যায়। যেন দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কুয়াশা এ সকালে কাটতে চায়। কিন্তু কাটে না। অমরেশ চায় হীরেণের কথা শুনে মীরা বাড়িতেই থাক— স্বামীকে ফাঁকি য়ো ভালোবাসায় অমরেশের আস্থা কম। সে অপেক্ষা করবে। মীরার ইনটেলেকচুয়্যাল মনের বিশ্লেষণীতে দুই পুরুষ চরিত্র এক হয়ে গেল। ঈর্ষা, সন্দেহ, হীনতায় হীরেণ তেমনি অর্থ, উদারতা ও অতিমানবীয় ত্যাগের দাঁড়িপাল্লায় প্রেমকে ওজন করতে চায় অমরেশ। রক্তমাংসের মীরার দুয়ারে কাছে অনুপস্থিত। হীরেণ বাজারে যায়। বাইরে হেমন্তের আশ্চর্য সুন্দর রৌদ্রে প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে নেচে আইভিলতার সঙ্গে প্রেম করছে যেন। মৃগাঙ্ক মীরার ঘরে। মীরা মৃগাঙ্কের ঘরে — মৃগাঙ্ক স্তুতি করতে থাকে মীরার। মীরার চোখে রং, মৃগাঙ্কর চোখেও। বলদৃপ্ত কঠিন বাহু বাড়িয়ে মীরাকে আকর্ষণ করে মৃগাঙ্ক। পাশের ঘরে শব্দ। রক্তের নদীতে হীরেণ ঢলে পড়েছে। রেজার ও রক্ত আর তার পাশে একটা খবরের কাগজ তাতে গতরাতের বাসের ঘটনা, এক নারীর নিজের স্বামী বলে বাঁচানোর চেষ্টা তারা পাশাপাশি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। বিপদবরণ ওই কাগজ হীরেণকে দিয়েছে, মালতী দেখেছে। মীরা ঠান্ডা মাথায়, কাগজটা পোড়াতে বলল মালতীকে। অমরেশের চেক, খবরের কাগজ, রেস্টুরেন্টের খবর বিপদবরণ, সব ঈর্ষায় জর্জরিত হীরেণকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে গেল মৃঙ্গাঙ্ক মনে করে, হীরেণ অনেক দিনেক দিন ধরেই ভুগছে। সব চেপে যন। মীরা-মৃগাঙ্ককেই তার নিকটতম ভাবে। খুঁজতে থাকে হীরেণের মেডিকেল রিপোর্টগুলো।

শেষ ঘটনার আগে মীরা আর্টিস্ট মৃগাঙ্কর কাছে। শিল্পী বলেছিল, সে ভুলে পুরনো ছবি, মুছে ফেলেছে সেই মডেল। ভোমরার মত স্ত্রীর আঘাত কাটিয়ে সে আজ মীরার মধ্যে নতুন মডেল পেয়ে গেছে। ভোমরাই যে মৃগাঙ্কর স্ত্রী উপন্যাসে এটি আর একটি আকস্মিক সমাপতন মীরা বলেছিল, অনন্ত রূপময় ব্রহ্মাণ্ডে আপনি শুধু একটি রূপের ধ্যান নিয়ে শিল্প হতে চেয়েছিলেন। পুরুষ হিসাবে আপনি দুর্বল, শিল্পী অনেক বড়ো। ভোমরাকে নিয়ে আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন। কেন করবো না, প্রত্যেক নারীই হিংসা করবে আপনাকে আপনার এই অবস্থা দেখলে। সহস্র রক্তচক্ষু যার, তার শুধু একটি জায়গায় দৃষ্টি রেখে পুড়ে মরে যেতে দেখা কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে না। মীরা যত্ন করে মৃগাঙ্ককে খাইয়েছে। মৃগাঙ্কর কথায় মীরা পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলে। অমরেশ কলেজে হীরেণের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল— কেন ওকে না বলে অমরেশের চেক সে এনেছে একটা অপরাধ। অথচ চেকটা হীরেণেরই চিকিৎসার জন্য। বিনা দোষে এত বড় শাস্তি মীরাকে দেবার অধিকার হীরেণের নেই। মৃগাঙ্কই তো দেখেছে হীরেমের জন্য মীরা কি করেছে।

আমরা আমাদের মত করে 'মীরার দুপুর' পড়লাম। এ পড়ার সঙ্গে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের গড়ার গরমিল থাকতেই পারে। উপন্যাসটি সামায়িকতার নানা চিহ্ন বহন করছে। কিন্তু এ চিহ্নগুলি আপতিক, আমাদের গূঢ় এমন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় 'মীরার দুপুর' যা আজ সমান প্রাসঙ্গিক। মীরা-হীরেণ, মীরা-অমরেশ, মীরা-মৃগাঙ্ক, ত্রিমাত্রিক সংলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে বিবাহ, এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে আবার একটি মেয়ে দয়া নয়, সাহায্য নয় নিজের রক্তমাংসের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাতে চেয়েছে, বারবার এক ধার -কর্যর মধ্য দিয়ে যে, ধার করা অস্তিত্ব থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে, স্বাধীন জীবিকায় মুক্তি চেয়েছে, এটাই তার বুদ্ধিজীবী স্বামীর কাছে ক্রাইম বলে মনে হয়েছে। সামনে যেমন দেখেছে ভোমরার উচ্চাকাঙক্ষা ধ্বংস হয়ে যাওয়া তেমনি বাড়ির কাজের লোক মালতীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও বাঁচা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেন দেখিয়ে দেন ঐ লেখাপড়া না জানা নিম্নবর্গের মালতী এমন আত্মমর্যাদায় বিপদকে প্রত্যাখ্যান করে, স্বামীর সন্দেহবাতিককে পায়ে দলে দিয়ে আবার নতুন পুরুষের সঙ্গে বাঁচে — বিয়ে নয়, লিভ ইন বা টুগেদার। সেও মরণোন্মুখ স্বামীকেই বাঁচাতে চেয়েছিল। মধ্যবিত্ত যে মৃত্যুপথযাত্রী, সেই ১৯৫০ এর দশকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বুঝেছিলেন।

উপন্যাসটিতে একাধিক চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখকের বীক্ষা ধরা পড়েছে — এমনকি বিপদবরণের মত ব্যক্তির শিল্প নিয়ে মন্তবেও। শিল্পকে যে সাধারণ মানুষ ও চারদিকের বাস্তব নিয়েই বাচতে হয়। উকিল একদিকে নির্বোধ অথচ চতুর — বিপদবরণের মুখেই শোনা যায়। অমরেশ, মীরা, মৃগাঙ্ক — সবাই এক অর্থে রিল্যায়েবল ন্যারেটর। এরা মিলেমিশে একটা বহুস্বর সিম্ফনি উপন্যাসটিতে বাজে। আর এক একজন পাঠক তো উপন্যাস এক একরকম পড়ে। 'মীরার দুপুর' পড়তে পড়তে কেন জানি শেক্সপীয়রকে মনে পড়ে। এ উপন্যাসের বড়ো উপাদান সন্দেহ ও ঈর্ষা। শেক্সপীয়রে এই ভালোবাসার পাত্রীকেই হত্যা করে, এখানে ঈর্ষায় আসে আত্মহনন। অথচ ঈর্ষার সঙ্গত কারণে কারণ ছিল না — মীরা তার সর্বস্ব দিয়ে তার মর্যাদাকে বিপন্ন করে হীরেণকে বাঁচাতে চেয়েছিল, ধার-কর্জর চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে। এমনকি কলেজ জীবনে যে অমরেশকে প্রত্যাখ্যান করে হীরেণকে বিয়ে করেছিল, তার কাছে যেতেও দ্বিধা করেনি যদিও সে আত্মসচেতন মানুষ। অন্যদিকে আত্মহননের যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ও দৃশ্য পাঠক দেখে তার মূলে বিপদবরণ — সে-ই হীরেণকে খবরের কাগজ দিয়েছে, রাতের ঘটনা বলেছে। তার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মোটিভলেস মোটিভহান্টিং -এ সে এই অনুঘটকের কাজ করে। কিংবা রক্তাক্ত হীরেণকে পড়ে থাকতে দেখে মীরা প্রথমে বিচলিত হলেও যে স্থিরতা, শীতল আচরণ দেখায় তাতেও শেক্সপীয়রের নারীকেই মনে পড়ায়। জীবন যে চলন্ত ছায়া, মীরা কি এটা বুঝেছিলেন, এখন তার সঙ্গী মৃগাঙ্ক।

'মীরার দুপুর' যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা উপন্যাসের আবহে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এক নতুন গল্প বলেছিলেন। আজও, ষাট বছর পরেও, ঐ গল্প বাংলা উপন্যাসের জগতে তার নতুনত্ব হারায়নি। মোটা গল্পের দিক থেকে উপন্যাসটি সকল স্বামীর সন্দেহ - ঈর্ষা একটি নারীর জীবনে কি বিড়ম্বনা আনে, তাকে পাল্টে দেয়, অবশেষে ঈর্ষা-সংশয়ের জালে স্বামী আত্মহত্যা করে। কিন্তু লেখকের দৃষ্টিকোণ এ-গল্পকে একাধিক ব্যক্তির চিন্তার সংঘাতে ঐ গল্পকে করে তোলে সামাজিক নানা জিজ্ঞাসার দর্পণ। হীরেণ-অমরেশ-মৃগাঙ্ক, কেউই একরৈখিক নয়, এমন কি বিপদবরণও নয়। মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের জট তাদের মনের গহণে : ব্যক্তিক ইতিহাসে। আর তারা উপদেশগত ভাবে পরস্পরের থেকে ভিন্ন — এক মধ্যবিত্ত বৃত্তেই কত রকম কতো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দেখিয়েছেন। এ গল্প মূলত চরিত্রগুলির মনের গল্প। আর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মীরা— ঐ মধ্যবিত্ত সত্তার মনের উদঘাটন সে যেমন করে, তেমনি নিজেও উদঘাটিত হয়। উপন্যাসের শুরুর মীরা আর শেষের মীরা এক নয়— শেষের মীরার আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন, সংলাপে-ভাবনায় এক অনন্য নারী, বাংলা উপন্যাসের জগতে।